প্রকৃতির বিচিত্র রূপ

পাহাড়ে সাদা সিঁড়ি

ধাপে ধাপে নেমে গেছে আশ্চর্য সুন্দর সিঁড়ি। হঠাৎ দেখে ভাবতে পারেন এমন সুন্দর সিঁড়ি বানাল কে? কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও এই সিঁড়ি মানুষের তৈরি নয়। তাহলে কীভাবে জন্ম হলো এই সিঁড়ির?

প্রাচীন শহর হাইরাপোলিসের নিচে অবস্থান পামুক্কালের। হাজার হাজার বছর ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে উষ্ণ প্রস্রবণ বা গরম পানির ঝরনার জল নেমে এসে সিঁড়ির মতো তৈরি করেছে। ওপর থেকে কখনো কখনো আবার একটু ঝিনুকের আকৃতির দেখায় ধাপগুলোকে। এই পানি জমে ছোট ছোট পুকুরের মতোও তৈরি হয়েছে নানা জায়গায়। এই সাদা সিঁড়ি এবং পুকুরগুলোকে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ পানি নিয়মিতই সমৃদ্ধ করে।

তুর্কি শব্দ পামুক্কালের অর্থ তুলার প্রাসাদ বা কটন ক্যাসল। ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ পানির কারণে এখানকার সিঁড়িগুলোর রং সাদা হয়। এতে একে অনেকটা ধবধবে সাদা তুলার প্রাসাদ বলে মনে হয়। আরও পরিষ্কারভাবে বললে, ক্যালসিয়াম জমে একধরনের পাথরের মতো তৈরি করে। যেটি ট্রাভেরটাইন নামে পরিচিত। এই ট্রাভেরটাইনেই গড়ে ওঠে এই ধাপ বা সিঁড়িগুলো।

এখানে গরম পানির ঝরনার সংখ্যা ১৭টি। পানির তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি থেকে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এগুলোর থেকে আসা ক্যালসিয়াম কার্বনেট নরম জেলের মতো জমা হয়। ধীরে ধীরে এগুলো ট্রাভেরটাইনে পরিণত হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে যখন হাইরোপোলিস শহরটি গড়ে ওঠে, তখন থেকেই প্রাকৃতিক এক দর্শনীয় এলাকা হিসেবে পরিচিতি পায় পামুক্কালে। বেশ কয়েকবারই ভূমিকম্পের পর পুনর্নির্মাণ হয় শহরটি। শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয় ১৩ শতকে। পরিত্যক্ত ওই শহর মন্দির, থিয়েটারের জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রাচীন এই শহর ও পামুক্কালে দুটোর টানেই পর্যটকেরা ছুটে যান জায়গাটিতে। মজার ঘটনা, এখানকার কার্বনেট-সমৃদ্ধ পানির রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আছে এমন বিশ্বাস আশপাশের মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে বহু আগে থেকেই।

হাইরোপোলিসের ধ্বংসাবশেষসহ পামুক্কালে ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। তবে একে বিশ্বঐতিহ্য ঘোষণার আগে এখানকার আশ্চর্য সিঁড়ি ধ্বংসের ঝুঁকিতে পড়ে গিয়েছিল। এর কিছুটা অযত্নে, কিছুটা বাণিজ্যিক কারণে। জায়গাটির ওপরেই হোটেল তৈরি করা হয়েছিল। মানুষ ময়লা পা আর জুতায় অনেকগুলো পুকুরের পানিকে বাদামি বানিয়ে ফেলেছিল।

দ্রুতই এ ধরনের হোটেলগুলো ভেঙে দেওয়া হয়। পুকুর বা ছোট লেকগুলোর প্রাকৃতিক সাদা রং ঠিক রাখতে এগুলোতে নামার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। ঝরনা থেকে নেমে আসা পানির প্রবাহও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একবারে কেবল নির্দিষ্ট কিছু পুকুর বা লেকে যেন যেতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হয়। পর্যটকদের গোসলের জন্য কৃত্রিম পুকুর তৈরি করা হয়।

পামুক্কালে ভ্রমণের সেরা সময় সেখানকার বসন্তে, অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আবহাওয়া ভালো থাকে, পর্যটকের চাপও খুব বেশি থাকে না। তবে গরমের মাসগুলোতে, মানে জুন থেকে আগস্টে পর্যটকের প্রচুর ভিড় থাকে কটন ক্যাসলে। সেক্ষেত্রে সকাল সকাল এলে শান্তিমতো উপভোগ করা যায় জায়গাটির সৌন্দর্য।

প্রকৃতিতে এমন বিষয় বিরল। তবে চিনের হুয়াংলয়ংয়ে এমন কিছু ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ পুল দেখা যায়। অবশ্য অনেকটা এমন আরেকটি চমৎকার নিদর্শনের দেখা পাবেন উত্তর ইরানের মাজানদারান প্রদেশে। জায়গাটি বাদাব-ই সুরত নামে পরিচিত। সেখানে গেলেই দেখবেন অনেকটা স্টেডিয়ামের গ্যালারির মতো ধাপে ধাপে নেমে গেছে সমতল তাক কিংবা চওড়া সিঁড়ি। তবে ওই সিঁড়ির রং সাদা নয়, উজ্জ্বল কমলা-লাল। নিউ জিল্যান্ডেও এ ধরনের একটি জায়গা ছিল। তবে সেটি ধ্বংস হয়ে গেছে ১৮৮৬ সালে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে।

পামুক্কালে তুরস্কের সবচেয়ে বেশি পর্যটক যায়, এমন জায়গাগুলোর একটি। সবচেয়ে কাছের শহর দেনিজলির দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটার। এখানকার সাদা সিঁড়ি এমনকি দেখা যায় দেনিজলি শহর থেকেও। সেখান থেকে বাস কিংবা ট্যাক্সিতে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারবেন জায়গাটিতে। বড় শহরগুলোর মধ্যে ইজমির থেকে গাড়িতে চার ঘণ্টা, কাস থেকে আড়াই ঘণ্টা এবং আনতালিয়া থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগে সাদা সিঁড়ির রাজ্যে পৌঁছাতে। কাজেই কখনো তুরস্ক ভ্রমণে গেলে চমৎকার এই জায়গায় 'অবশ্যই যেতে হবে'; এমন জায়গার তালিকায় রাখবেন আশা করি।

পাহাড়ের গায়ে এত রং

আগে থেকে জানা না থাকলে পাহাড়গুলো দেখলে চমকে উঠবেন। ভাববেন এভাবে নানা রঙে রাঙিয়ে দিল কে এগুলোকে। কিন্তু এত বিশাল সব পাহাড় তো রং-তুলির আঁচড়ে রাঙানোর সুযোগ নেই! আশ্চর্যজনক হলেও প্রাকৃতিকভাবেই এখানকার পাহাড়গুলো এমন নানা রঙে সেজেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অরিগনের হুইলার কাউন্টির জন ডে ফসিল বেডস যে তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত তার একটি এই পেইন্টেড হিলস। বুঝতেই পারছেন এমন নানা রঙের আল্পনার জন্যই এ নাম পেয়েছে জায়গাটি। বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক সময়ে এই বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। প্রাচীনকালে জায়গাটি যখন নদীবিধৌত সমতল এলাকা ছিল, তখনই মূলত এটা ঘটে। কালো, ধূসর, লালসহ নানা রঙের দেখা পাবেন এখানে। বৃষ্টিতে যখন ভিজে থাকে তখন আরও বেশি আকর্ষণীয় মনে হয় জায়গাটিকে। এই বর্ণিল পাহাড়রাজ্যের আয়তন ৩ হাজার ১৩২ একর।

এঁটেল মাটি সমৃদ্ধ এখানকার পাহাড়-টিলা গায়ে মেখে থাকা এই রঙের সৃষ্টি সাড়ে ৩ কোটি বছরের বেশি আগে। এলাকাটি যখন সমতল ছিল, তখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে জমা হওয়া ছাই, ভস্মে এমন রং তৈরি হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এভাবে সমতল জমি থেকে বর্ণিল পাহাড়ে রূপান্তর ঘটল? উত্তরটা কঠিন কিছু নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন খনিজসমৃদ্ধ আগ্নেয়গিরির ছাই, ভস্ম কঠিন হয়ে বিভিন্ন স্তরের তৈরি করেছে। এই কঠিন স্তরগুলো মিলেই তৈরি হয় পাহাড়, টিলা।

সমতলে জন্মানো বিভিন্ন গাছপালা থেকে তৈরি হওয়া কয়লা কালো রঙের কারণ। ধূসর অংশগুলো হলো নরম শিলা, কাদামাটি। এলাকাটি যখন উষ্ণ ছিল তখন নদীর পানির সঙ্গে বয়ে আসা পলি থেকে তৈরির লালচে মাটির কারণে এখানকার পাহাড় পেয়েছে লাল আর কমলা আভা। হলুদাভ বাদামি, হলুদ, সোনালি আভাও পাবেন এখানকার পাহাড়ি মাটিতে।

পাহাড়-টিলাগুলোর রং ঋতুভেদে, আবহাওয়ার ওপর এবং দিনের বিভিন্ন সময় বদলায়। এর কারণে সূর্যের আলো ভিন্ন কোণে পড়া। প্রবল বৃষ্টিসহ একটি ঝড়ের পর সাধারণত সবচেয়ে মনোহর রূপে ধরা দেয় এখানকার প্রকৃতি। তখন প্রতিটি রং সবচেয়ে তীব্রভাবে ফুটে ওঠে। ঋতুভেদে আরও নানা বৈচিত্র্য চোখে পড়ে জায়গাটিতে। এপ্রিল-মে'তে ছোট ছোট হলুদ ফুলে ঢেকে যায় লালচে পাহাড়ের ফাটল। তখন লাল-হলুদে মিলে আরেক ধরনের সৌন্দর্যের জন্ম হয়। এ সময় আলোকচিত্রী ও চিত্রশিল্পীদের পছন্দের গন্তব্য হয়ে ওঠে এটি।

শীতের সময়েও পর্যটকে পূর্ণ থাকে জায়গাটি। হালকা একটা তুষারপাতের পর চেহারাই পাল্টে যায় পাহাড়রাজ্যের। বিভিন্ন রঙের মাঝখানে তুষারের ধবধবে সাদা অদ্ভুত এক বর্ণবৈচিত্র্যের জন্ম দেয়। এই জায়গাটির বড় সুবিধা হলো গোটা বছরজুড়েই এখানে যেতে পারবেন। আর আগেই বলেছি একেক সময় সে ধরা দেবে একেক রূপে। চমৎকার কিছু ট্রেইলও চোখে পড়বে পার্কটিতে। বর্ণিল পাহাড়সহ গোটা পার্ক এলাকাটি জীবাশ্মবিদদেরও খুব প্রিয় এক জায়গা। কারণ, প্রাগৈতিহাসিককালের গন্ডার, ঘোড়া আর উটের ফসিলে ভরপুর এটি। মোটের ওপর জায়গাটি তাই পর্যটক থেকে শুরু করে গবেষক, আলোকচিত্রী ও শিল্পী সবারই প্রিয় এক গন্তব্য।

সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন পার্কটির ক্লারনো ইউনিটে। জলপ্রপাত আর আগ্নেয়গিরির লাভা, ধূম জমে যেখানে বিভিন্ন অদ্ভুতুড়ে স্তম্ভ তৈরি হয়েছে। এদিকে টমাস কনডন পেলিওনটলোজি সেন্টারে বাঁকানো দাঁতের বা সেবার টুথের বিড়াল গোত্রের প্রাণীদের ফসিল দেখতে পাবেন। মোটামুটি ৪০ হাজার ফসিল আছে এখানে। এই এলাকাটিতে কীভাবে একসময় এখনকার হাতি ও গন্ডারদের পূর্ব পুরুষেরা মহানন্দে চষে বেড়াত সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

কিন্তু পেইন্টেড হিলসে পৌঁছাবেন কীভাবে? অরিগনের ছোট্ট শহর মিশেলের কেবল ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই বর্ণিল পাহাড়রাজ্যের অবস্থান। সেখান থেকে সহজেই পৌঁছে যেতে পারবেন জায়গাটিতে। তবে কাছের সবচেয়ে বড় শহর অরিগনের বেন্ড। সেখান থেকে ঘণ্টা দুই লাগবে। পোর্টল্যান্ড থেকে গাড়িতে এলে লাগবে পাঁচ ঘণ্টা। তবে যেভাবেই আসা হোক না কেন, অরিগনের পেইন্টেড হিলস যে আপনার মনকেও রাঙিয়ে দেবে তাতে সন্দেহ নেই।